বিজ্ঞান শিশুতোষ সিরিজ

বুক - ২

# জীবন্ত কোষ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
ডিপ্লোমা ইন সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, এইচ.সি.এফ.ই., ইংল্যান্ড।


INTERNET EDITION

## প্রকাশকের কথা

বিজ্ঞান একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। শিশু-কিশোররা এ বিষয়ে জানতে খুব আগ্রহী। বিজ্ঞান আমাদেরকে জতৎসৃষ্টির কৌশলাদি উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞানের নির্যাস হচ্ছে প্রযুক্তি। আর প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে চলছে। নিত্য-নতুন যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে চমক লাগাচ্ছে। দ্রুত গড়ে তুলছে বিজ্ঞান ও উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক এক অবিশ্বাস্য বিশ্বসমাজ।

আমাদের শিশু-কিশোররা বিজ্ঞানের প্রতি দিন দিন বেশি বেশিকরে আগ্রহশীল হয়ে ওঠছে। এর ফলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হচ্ছে। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের সুযোগ-সুবিধা আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা এখনও তেমনটি পাচ্ছে না। বিশেষকরে বাংলা ভাষায় শিশু-কিশোরদের জন্য বিজ্ঞানের বইয়ের অত্যন্ত অভাব রয়ে গেছে। বর্তমান এই শিশুতোষ সিরিজ সে অভাব পূরণে কিছুটা হলে অবদান রাখবে এটাই আশা।

লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী সত্তুর দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর ইংল্যান্ডে উচ্চতর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিজ্ঞানের বইও আছে। তার রচিত 'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' নামক একটি বই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সিরিজে গ্রন্থের সংখ্যা অন্তত ১০টি হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা সবার নিকট দুআ প্রার্থী।



প্রকাশক: মমতাজ বেগম বারী

প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ মে, ২০১৮।

অঙ্গসজ্জা ও বর্ণবিন্যাস: গ্রন্থকার।



**খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী**
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

Biggan Shishutush Series: Book 2, "Jibanta Kush" [Living Cells] by Engineer Azizul Bari, Dip. Sci. & Tech. England. Published by "KHANQA-E-AMINIA-ASGARIA", Ali Center, Subidbazar, Sylhet. First edition: May 2018. Price: Taka 50.00 only.

# কোষ বিজ্ঞান
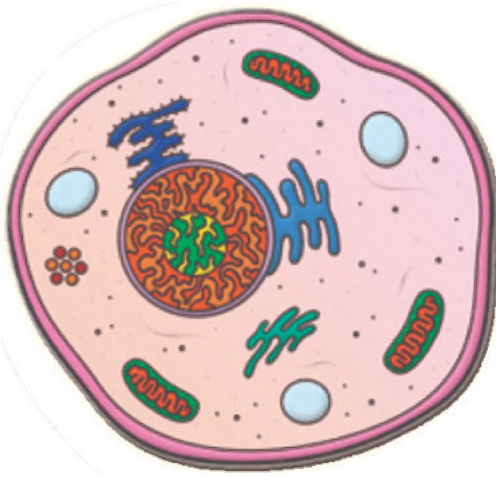
কোষ বা সেল (cell) হচ্ছে প্রাণিদেহের মৌলিক বস্তু। বায়ের চিত্রে একটি কোষের অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দেহে আছে ৮০ ট্রিলিয়ন (৮০ হাজার মিলিয়ন) কোষ। এগুলোকে দেহের পাওয়ার প্ল্যান্ট বলা যায়। তবে কোনো কোনো প্রাণির দেহ একটিমাত্র কোষের তৈরি- যেমন, জীবাণু। অপরদিকে অন্যদের দেহ তৈরি হয়েছে মিলিয়ন-বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে। বলা যায় কোষই হচ্ছে প্রাণিদেহ।

প্রতিটি কোষ কিন্তু একেকটি জীবন্ত প্রাণ। কারণ এরা খাদ্য গ্রহণ করে, শ্বাস-নিঃশ্বাস নেয়, বর্জ্য নিঃসৃত করে এবং বংশ বিস্তারও করে। কোষের খাদ্য হচ্ছে এনার্জি। যেমন: চিনি, মেদ ও প্রোটিন। কোষ সেলুলার রেসপিরেশন (শ্বাস-নিঃশ্বাস) এর মাধ্যমে এনার্জি তৈরি করতে যেয়ে বর্জ্য হিসেবে পানি ও কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস নিঃসৃত করে। ডানের চিত্রে আরেকটি কোষ দেখা যাচ্ছে।
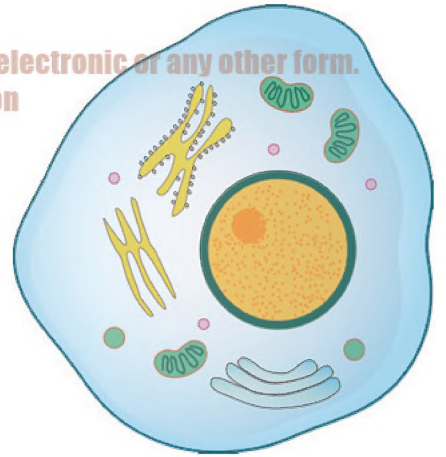


কোষ নিজেরাই নিজেকে কপি করার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। আমরা সবাই জীবন শুরু করেছি একটি মাত্র কোষ থেকে। এটা বিভক্ত হতে হতে অসংখ্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং কোষ সম্পর্কে যতো বেশি জানা যাবে ততো বেশি প্রণিসৃষ্টির কৌশলও জানা হয়ে যাবে- তাই না? সুতরাং এসো খুব সরল ভাষায় কোষ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করি।

# বিভিন্ন ধরনের কোষ

কোষের ধরন মূলত দুটি: (১) প্রক্যারিওটিক (prokaryotic) ও ২. ইউক্যারিওটিক (eukaryotic)। এ দুটি সম্পর্কে একটু পরই তোমরা আরো জানবে। কার্যকারিতার দিক থেকে চিন্তা করলে কোষের ধরন অসংখ্য। বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মানবদেহে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কোষ আছে: স্নায়ু কোষ, মস্তিষ্কের কোষ, পেশি কোষ, রক্ত কোষ, চামড়ার কোষ ইত্যাদি।

রক্তকোষ

## (১) প্রক্যারিওটিক (prokaryotic) কোষ
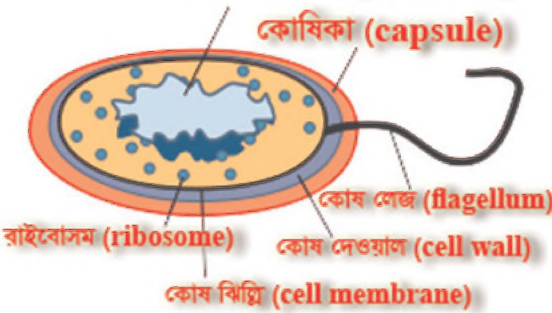


প্রক্যারিওটিক কোষ

এটা একটি সাধারণ কেন্দ্রহীন কোষ। ক্ষুদ্রপ্রাণির (bacteria) দেহ এই কোষের তৈরি হয়ে থাকে। প্রক্যারিওটিক কোষের মধ্যে তিনটি মৌলিক অংশ আছে:

(ক) বাইরের নিরাপত্তা বেষ্টনী যাকে কোষের খাম (envelope) বলা যায়। এতে আছে দেওয়াল (wall), ঝিল্লি (membrane) ও কোষিকা (capsule)। বায়ের চিত্রটি দেখো।

(খ) লেজের মতো লম্বা অংশ যাকে ফ্লাজেলাম (flagellum) বলে। এটা নেড়ে নেড়ে কোষ চলন্ত হয়। লক্ষণীয় সকল প্রক্যারিওটিক কোষে এই লেজটি নেই।

(গ) অভ্যন্তরীণ অংশ যাকে সাইটোপ্লাজমিক এলাকা (cytoplasmic region) বলে। এতে আছে নিউক্লিওয়েড (কেন্দ্রীয় এলাকা), সাইটোপ্লাজম (cytoplasm - কোষের বিপাক অংশ) এবং রাইবোসম (ribosome - প্রোটিন তৈরির যন্ত্র)।

## ২. ইউক্যারিওটিক (eukaryotic) কোষ

এসব কোষ অপরটি থেকে বেশ বড়ো ও অধিক জটিলভাবে তৈরি। এদের একটি সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র আছে। এতে অবস্থান করে ডিএনএ নামক মলিকিউল। এরূপ কোষের তৈরি হচ্ছে মানুষসহ সকল জীব-জন্তু এবং উদ্ভিদের দেহকাঠামো।

ইউক্যারিওটিক কোষের অনেক আলাদা অংশ আছে। প্রত্যেকটি একেকটি কাজে নিয়োজিত থাকে। নিচে মূল কয়েকটি অংশের নাম ও তাদের কাজ সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরেছি।



**(ক) মেমব্রেন (membrane):** একে বাংলায় ঝিল্লি বলে। এটা হচ্ছে কোষের বাইরের সীমানা। একে কোষের চামড়াও বলা চলে। এর কাজ হলো প্রয়োজনীয় বস্তু ভেতরে ঢুকতে দেওয়া ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রবেশ হতে বাধা দান করা।

**(খ) মাইটোকোন্ড্রিয়া (mitochondrea):** এখানেই কোষ তার এনার্জি তৈরি করে। আমাদের দেহে, যেসব খাবার আমরা হজম করি তা অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে রসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে। আর এ প্রতিক্রিয়ার স্থান হচ্ছে মাইটোকোন্ড্রিয়া। এটা কোষের জন্য এনার্জি তৈরি করে।

**(গ) নিউক্লিয়াস (nucleus):** এটা হচ্ছে কোষের কেন্দ্র। বলা যায় কোষের মগজ হলো নিউক্লিয়াস। এটা ক্রমোসম (chromosome) নামক মলিকিউল দ্বারা সমগ্র কোষকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

**(ঘ) সাইটোপ্লাজম (cytoplasm):** এই বস্তু দ্বারা কোষের বাকি অংশ পরিপূর্ণ থাকে। এরই মধ্যে কোষের অন্যান্য অংশ সাঁতার কেটে বেড়ায়। সাইটোপ্লাজম মূলত পানির তৈরি।

**(ঙ) লাইসোসম (lysosome):** এদের কাজ হলো সমগ্র কোষকে পরিষ্কার রাখা। এরা কোষের বর্জ্য ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বস্তু কোষ থেকে নির্মূল করে দেয়।

**(চ) নিউক্লিওলাস (nucleolus):** এটা নিউক্লিয়াসের ভেতর অবস্থান। গোলাকার অরগ্যানের কাজ হলো rRNA নামক একটি মলিকিউল তৈরি করে। এই মিকিউল থেকেই রাইবোসম (ribosome) নামক বস্তু সৃষ্টি হয়, যার কাজ হলো প্রোটিন তৈরি করা।

**(ছ) ভাকিওল (vacuole):** এগুলো হচ্ছে কোষের সংরক্ষণ বা স্টোরিজ বুদ্বুদ (বাবল্)। ভাকিওলে সংরক্ষিত থাকতে পারে কোষ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন উপাদান। এরা অবশ্য কোষের বর্জ্যও সংরক্ষণ করে থাকে, যাতেকরে কোষটি বর্জ্যদূষণ থেকে নিরাপদ থাকে।

**(জ) গল্‌জি এ্যাপারেটাস (Golgi apparatus):** এই অরগ্যানের কাজ হলো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকোলাম নামক বস্তু থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও লিপিড (মেদ) মলিকিউলকে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে শ্রেণিভুক্ত করে সাজানো। এরপর গেছাগাছ করে এসব বস্তুকে ভেসিকল্ (vesicle) নামক মুখ বন্ধ থলেতে সংরক্ষণ করা।



**(ঝ) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকোলাম (endoplasmic reticulum):** এগুলো পাইপের মতো অরগ্যান যারা কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। এরা প্রোটিন ও লিপিড সিনথেসিসের কাজে সক্রিয় থাকে।

প্রক্যারিওটিক কোষের বিভিন্ন অরগ্যান
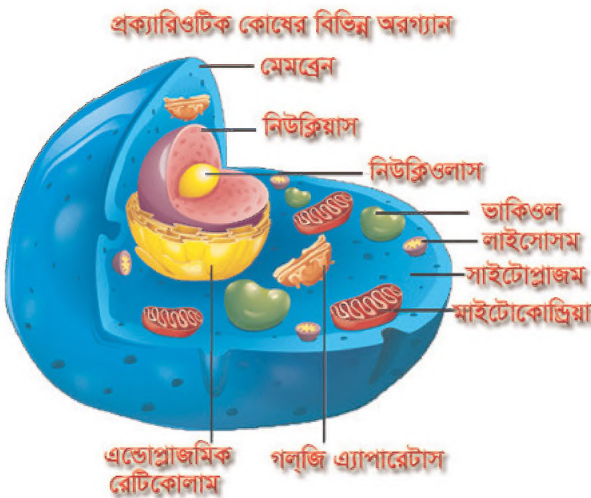
কোষের অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত যন্ত্রগুলোর নাম হলো অরগ্যানাল (organelle)। আমরা বাংলায় কোষযন্ত্র বলতে পারি। সব কোষযন্ত্র মিলে কোষের অস্তিত্ব বজায় রাখে। আর সব কোষ মিলেই প্রাণিদের দেহ

সৃষ্টি হয়েছে। রোগমুক্ত, সবল, কর্মঠ ও প্রাণবন্ত কোষ সম্বলিত দেহ মানেই স্বাস্থ্যবান প্রাণিদেহ। কোষযন্ত্রের উপরোক্ত নামগুলো শিখে নেওয়াই এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এগোর কার্যকারিতা সম্পর্কে এখন তেমন ভাববে না। বড়ো হয়ে কোষ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানার্জনের সময় তোমরা এসব ব্যাপার ঠিকই বুঝতে পারবে।

## তোমরা জানো কী?

- হাঁস, মুরগিসহ সকল পাখিদের ডিম একটি মাত্র কোষের তৈরি।

- উটপাখির (ostrich) ডিম হলো আমাদের জানা সর্বাধিক বড়ো একক কোষ। এর ওজন ১.৩৬ কিলোগ্রাম থেকেও অধিক হতে পারে।
- মানবদেহের সর্বাধিক দীর্ঘ কোষ হচ্ছে স্নায়ুকোষ। এদের অবস্থান মগজের সঙ্গে সংযুক্ত মেরুদণ্ড তন্ত্রী থেকে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত। এসব কোষের দৈর্ঘ্য ১ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- একই প্রকার অনেক কোষ যখন একত্রে থাকে তখন একে টিস্যু বলা হয়।
- ইংরেজি শব্দ 'cell' এসেছে গ্রিক 'cellula' শব্দ থেকে, যারা অর্থ হলো ক্ষুদ্র কামরা।
- মানবদেহে নিজস্ব কোষের চেয়ে জীবাণু কোষের সংখ্যা বেশি! ইয়াখ!



মানব স্নায়ুকোষ

# কোষ বিভক্তি
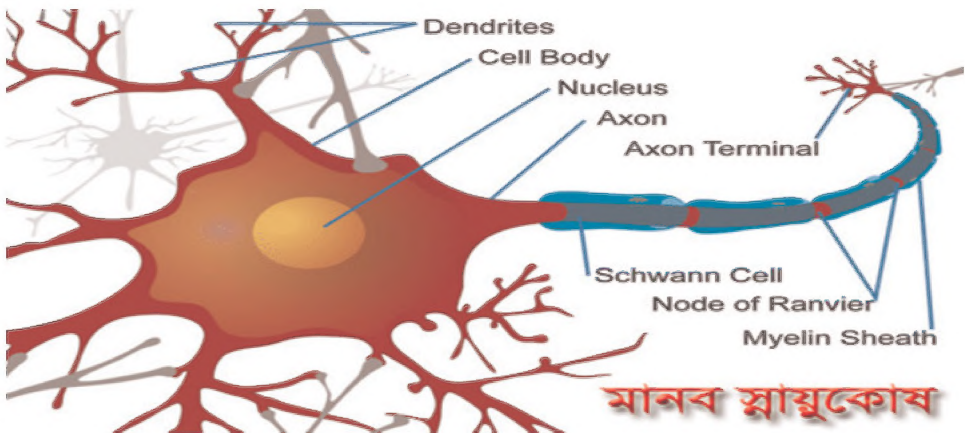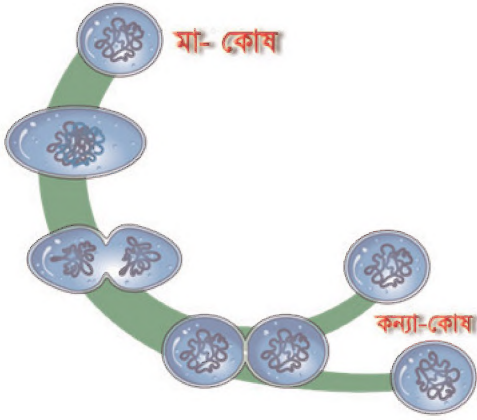
সকল জীবন্ত প্রাণি সর্বদা নতুন কোষ তৈরি করে থাকে। দেহ বেড়ে ওঠা ও পুরাতন মৃত কোষ প্রতিস্থাপন হেতু নতুন কোষের প্রয়োজন দাঁড়ায়। যে উপায়ে নতুন কোষ তৈরি হয় তাকে বলে কোষ বিভক্তি বা বিভাজন। কোষ বিভক্তি সব সময় ঘটছে। মানবদেহে দৈনিক ২ ট্রিলিয়ন (২ হাজার বিলিয়ন) কোষ বিভক্তি ক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিভাবে এ বিভক্তি হয়ে থাকে? এসো, জেনে নিই- কেমন?

তিনটি মৌলিক উপায়ে কোষ বিভাজন ক্রিয়া সংঘটিত হয়: **(১) বাইনারি (binary - জোড়া) ফিশন (fission), (২) মাইটোসিস (mitosis) ও (৩) মেইওসিস (meiosis)।**



## (১) বাইনারি (binary-জোড়া) ফিশন (fission)

সাধারণত এককোষবিশিষ্ট প্রাণিদের প্রক্যারিওটিক কোষ বাইনারি ফিশন পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়। এভাবে কোষ বিভাজনকে ইংরেজিতে 'asexual' বলে। এর অর্থ অন্য কোনো কোষ- যেমন যৌনকোষ দ্বারা ফলনশীল (fertilize) করার প্রয়োজন পড়ে না। বাইনারি কোষ বিভাজন ক্রিয়া খুব সহজভাবে হয়ে থাকে। পাশের চিত্রটি থেকে এ ব্যাপারটি তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে।
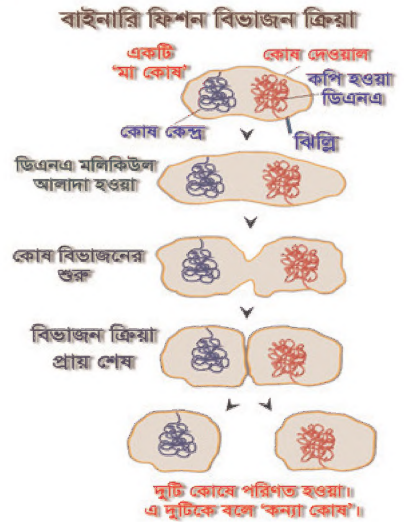
## (২) মাইটোসিস (mitosis)

মানবদেহ ও অন্যান্য জীব-জন্তর দেহে মাইটোসিস ক্রিয়ায় কোষ বিভাজন হয়ে থাকে। একটি বিভক্ত হয়ে যে দুটি কোষ সৃষ্টি হয়- তা মূল কোষটির হুবহু কপি। অর্থাৎ উভয় কোষের ডিএনএ, কার্যকারিতা, জেনেটিক কোড (genetic code) ইত্যাদি হুবহু তাদের মা-কোষের মতো। মাইটোসিস কোষ বিভক্তি ক্রিয়া বেশ জটিল। এরপরও আমাদেরকে কিছুটা তো বুঝতেই হবে- তাই না? মূলত তিনটি পর্যায়ে এ বিভাজন সংঘটিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:



**(ক) প্রফেইজ (prophase):** এ পর্যায়ে কোষের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যায়। মূল কোষটি এখন পরিণত হলো একটি কোষে- যার মধ্যে দুই জোড়া ক্রমোসম বিদ্যমান। এ অবস্থায় কোষ স্থিতিশীল থাকতে পারে না তাই শীঘ্রই দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রিয়া শুরু হয়। [ক্রমোসম সম্পর্কে পরে জানতে পারবে]

**(খ) মেটাফেইজ (metaphase):** বিভক্ত হওয়ার পূর্বে উভয় জোড়া ক্রমোসম কোষের দেওয়ালের নিকট এসে দাঁড়িয়ে যায়।

**(গ) এ্যানাফেইজ (anaphase):** এ পর্যায়ে সত্যিকার বিভক্তি শুরু হয়। উভয় ক্রমোসম বিপরীত দেওয়ালের নিকট চলে যায়।

**(ঘ) টেলোফেইজ (telophase):** এ পর্যায়ে এসে মাইটোসিস ক্রিয়ার মাধ্যমে উভয় জোড়া ক্রমোজামের চতুর্দিকে দুটি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা ঝিল্লি সৃষ্টি হয়। এরপর ক্রমোসমগুলো আঁটসাঁট অবস্থা থেকে মেলে যায়। এর ফলে কোষের দেওয়াল মাঝখানে বিভক্ত হয়ে আলাদা দুটি কোষে পরিণত হয়ে পড়ে। নতুন দুটি কোষকে

বলে কন্যা কোষ। অর্থাৎ একটি মাত্র মা-কোষ থেকে দুটি কন্যা কোষের জন্ম হলো- যাদের সবকিছু ঠিক মা-কোষের নকল বা ডুপ্লিকেট।

## (৩) মেইওসিস (meiosis)

এরূপ কোষ বিভক্তি মূলত ঐ সময় সংঘটিত হয় যখন পুরো প্রাণিটি বিভক্ত হওয়ার সময় হয়। অর্থাৎ একটা থেকে একাধিক প্রাণি জন্ম নেওয়ার সময় এই বিভক্তি ঘটে। এরূপ কোষ বিভক্তি ঘটে যখন যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে পুনর্জনন হয়ে থাকে- যাকে বলে জননকোষ বা 'gamete' (গ্যামিট)।

মাইটোসিস ও মেইওসিসের মধ্যে দুটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমত: মাইটোসিস দ্বারা একটি কোষ থেকে দুটি নকল কন্যা কোষ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মেইওসিস ক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কোষ থেকে চারটি কোষ আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত: মাইটোসিস ক্রিয়ার সৃষ্ট নতুন কোষদ্বয়ের মধ্যে মা-কোষের সমান সংখ্যক ডিএনএ মলিকিউল তৈরি হয়। অপরদিকে মেইওসিস ক্রিয়ায় সৃষ্ট চারটি কোষগুলোর মধ্যে মা-কোষের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ ডিএনএ মলিকিউল তৈরি হয়। [ডিএনএ সম্পর্কে একটু পরই জানবে]



আরো জানার ব্যাপার হলো, মাইটোসিস থেকে সৃষ্ট কোষ দুটিকে বলে ডিপলোইড - কারণ তাদের মধ্যে দুটি করে পূর্ণ ক্রমোসম থাকে। অপরদিকে মেইওসিস থেকে সৃষ্ট চারটি কোষকে বলে হ্যাপলোইড - কারণ তাদের মধ্যে থাকে মূল কোষের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ ক্রমোসম। জটিল মেইওসিস কোষ বিভাজন ক্রিয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু বলছি না। তবে নিচের চিত্রটি দেখে নাও। বায়োলজির ওপর উচ্চতর লেখাপড়াকালে তোমরা এ ব্যাপারে আরো জানতে পারবে।

# ডিএনএ ও ক্রমোসম

আমরা বেশ কয়েকবার ডিএনএ (DNA) ও ক্রমোসম (chromosome) শব্দদ্বয় প্রয়োগ করেছি। তবে এ দুটি শব্দ দ্বারা কী বুঝাচ্ছে তাতো স্পষ্ট করি নি। এসো, আমরা এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা জেনে নিই।

## ডিএনএ (DNA) ও জীন

শব্দটি আসলে একটি দীর্ঘ শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ। ডিএনএ (DNA) মানে 'DoxiriboNucleicAcid'। কঠিন, না? দেখি, আমরা সহজে বুঝতে পারি কি না। বায়ে ডিএনএ'র একটি চিত্র তুলে ধরেছি। দেখে নাও।

ডিএনএ একটি মলিকিউল। এটা প্রাণিদেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বস্তু। এর ভেতরে দেহের বিভিন্ন অংশ কিভাবে তৈরি ও বেড়ে ওঠবে তার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনাবলী সংরক্ষিত থাকে।

## ডিএনএ কিসের তৈরি?

উপরের চিত্রটির প্রতি লক্ষ করো। ডিএনএ একটি দীর্ঘ পাতলা মলিকিউল যা মূলত 'নিউক্লিওটাইড' (nucleotide) নামক বস্তুর তৈরি। চারটি ভিন্ন ধরনের নিউক্লিওটাইড আছে। এদের নাম: **(১) এ্যাডেনাইন (adenine), (২) থাইমাইন (thynine), (৩) সাইটোসাইন (cytosine) ও (৪) গুয়ানাইন (guanine)**। এদের প্রতিটিই একেকটি ছোট্ট মলিকিউল। এতে আছে চিনি ও ফোসফেইথ (phosphate)।

উক্ত চারটি নিউক্লিওটাইডকে সাধারণত তাদের প্রথম অক্ষর দ্বারা সনাক্ত করা হয়। যেমন: **A - adenine; T- thynine; C- cytosine; G- guanine**।

সকল নিউক্লিওটাইডকে একটি মেরুদণ্ড ধরে রেখেছে। এটি ফোসফেইথ (phosphate) ও ডিওক্সিরাইবো (deoxiribose) নামক দুটি মলিকিউলের তৈরি। নিউক্লিওটাইডকে 'বেইজ' (base) বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

## DNA- এর কাজ

আমাদের দেহে ২১০ ধরনের কোষ আছে। প্রতিটি কোষ ভিন্ন কাজে জড়িত থেকে পুরো দেহটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। আমাদের মধ্যে আছে রক্তকোষ, হাড্ডির কোষ এবং পেশির কোষ ইত্যাদি।

প্রতিটি কোষকে তার কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। আর এ কাজের নির্দেশনা আসে কোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে অবস্থানরত ডিএনএ মলিকিউল থেকে। মনে করো ডিএনএ কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা কোড (নির্দেশনা) এবং কোষ হলো কম্পিউটার বা এর হার্ডওয়্যার।



## ডিএনএ কোড

উপরে বর্ণিত নিউক্লিওটাইডেই ডিএনএ'র কোড সংরক্ষিত থাকে। কোষ এসব নির্দেশনা 'পড়ে' নেয়, যা চারটে অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। প্রত্যেক ৩টি অক্ষর মিলে একেকটি শব্দ তৈরি হয়- যাকে কোডোন (পড়ফড়হ) বলে। কয়েকটি কোডোনের নমুনা নিম্নরূপ:

**ATC, TGA, GGA, AAT, GAC, CAG**

যদিও চারটি মাত্র অক্ষর আছে, ডিএনএ মলিকিউল হাজার হাজার শব্দ দীর্ঘ থাকায় বিলিয়ন বিলিয়ন শব্দমিশ্রণ সম্ভব। সুতরাং কম্পিউটারের কোটি কোটি নির্দেশনার মতো ডিএনএ থেকেও কোটি কোটি নির্দেশনা আসতে পারে- এবং এসেও থাকে।

# ডিএনএ ও জীন

ডিএনএ'র মধ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা সেট আছে- এগুলোই হচ্ছে এককেটি জীন। জীনের কাজ হলো কোষকে বলে দেওয়া, কোনো বিশেষ ধরনের প্রোটিন মলিকিউল কিভাবে তৈরি করতে হয়। আর প্রোটিন কোষ ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে ও বেড়ে ওঠতে।
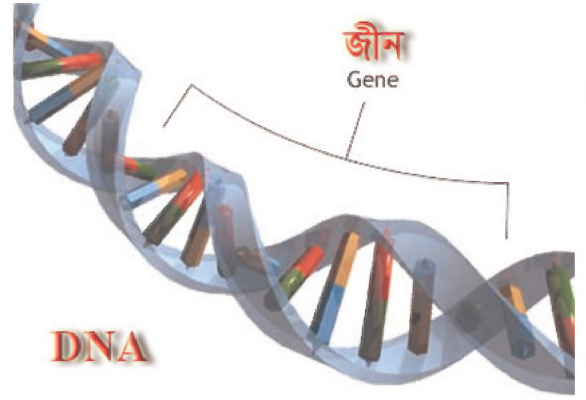
## ডিএনএ'র আকার

ডিএনএ আকারে অনেকটা স্ক্রু এর মতো পেঁচানো- যাকে বলে 'ডবল হিলিক্স' (double helix)। যে দুটি দীর্ঘ বস্তু বাইরে পেঁচানো থাকে ওগুলোই হচ্ছে ডিএনএ'র মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের মধ্যেই সবগুলো নিউক্লিওটাইড বেইজের অবস্থান।



নিউক্লিওটাইড বেইজগুলো কিন্তু বিশেষ আইন মেনে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এগুলো 'জিগসো পাজ্‌ল' (jigsaw puzzle) এর মতো: শুধুমাত্র A বেইজ একটি T বেইজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং G বেইজ একটি C বেইজের সঙ্গে যুক্ত হবে।



ডিএনএ সম্পর্কে এ বইয়ে আর বেশি বলা আদৌ মানানসই নয়।

## তোমরা কী জানো?

- পৃথিবীর সকল মানুষের ৯৯.৯ শতাংশ ডিএনএ হুবহু একই ধরনের। ঐ ০.১ শতাংশের কারণে আমরা একে অন্য থেকে ভিন্ন।
- তোমার দেহের সকল ডিএনএ মলিকিউল যদি একটা আরেকটার পাশাপাশি রাখা হয়, তাহলে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পর্যন্ত কয়েকবার যাওয়া-আসার সমপরিমাণ দীর্ঘ হবে!

# ক্রোমোসোম (chromosome)
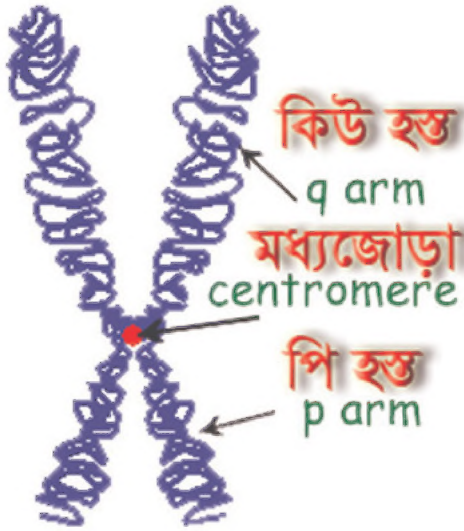
কোষের ভেতরে ডিএনএ ও প্রোটিন নামক মলিকিউল দ্বারা ক্রমোসম তৈরি। এদের কাজ হলো কোষকে নির্দেশ করা কিভাবে কী করতে হবে ও কখন কিভাবে বিভক্ত হতে হবে। প্রত্যেক প্রাণিদেহের মধ্যে তার নিজস্ব কিছু আলাদা নির্দেশনা আছে। তোমার ক্রমোসমই নির্দিষ্ট করে চোখের রং কী হবে, উচ্চতা কতো ফুট হবে এবং তুমি ছেলে না মেয়ে হবে ইত্যাদি।

## এদের অবস্থান



ক্রমোসম থাকে কোষের অভ্যন্তরস্থ সকল নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে। প্রতিটি কোষে কী পরিমাণ ক্রমোসম আছে তা নির্ভর করে প্রাণিটি কী। মানবকোষে আছে ২৩ জোড়া ক্রমোসম। অর্থাৎ প্রত্যেক কোষে আছে মোট ৪৬টি ক্রমোসম। এগুলোই মানবদেহের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করে।

## কীভাবে এগুলো দেখবো?

এদের আয়তন এতো ক্ষুদ্রকায় যে, শক্তিশালী মাইক্রস্কোপ দ্বারাও এগুলো দেখা যায় না। কিন্তু যখন কোষ বিভক্ত হওয়ার সময় আসে তখন এরা আঁটসাঁট হয়ে যায়। এসময় বিজ্ঞানীরা উন্নতমানের মাইক্রস্কোপ দ্বারা এদের দেখতে পারেন। সাধারণত এরা জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। দেখতে অনেকটা ক্ষুদ্রকায় কেঁচোর মতো লাগে।

## জীন (gene)

প্রত্যেক ক্রমোজামের ভেতর আছে ডিএনএ মলিকিউলের বিশেষ অংশ- এ অংশকে জীন বলে। আমরা ইতোমধ্যে জীনের একটি ছবি দেখেছি।

প্রত্যেক জীনে আছে প্রোটিন তৈরির বিশেষ কোড বা নির্দেশনা। এই প্রোটিনই নির্দিষ্ট করে আমরা কীভাবে বেড়ে ওঠবো এবং পিতা-মাতার নিকট থেকে কী জিনিসের উত্তরাধিকার হচ্ছি। এ কারণেই জীনকে কেউ কেউ 'বংশগতির একক' বলে থাকেন।

## মানব ক্রমোসম (human chromosome)

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি মানুষের মধ্যে আছে মোট ২৩ জোড়া ক্রমোসম। অর্থাৎ মোট ক্রমোসম সংখ্যা হলো ৪৬। জোড়া বলার কারণ কী? এর কারণ হলো আমাদের মধ্যে দুই ধরনের ক্রমোসম আছে। এর একটিকে বলে এক্স (X chromosome) এবং অপরটিকে বলে ওয়াই (Y chromosome)। মোটকথা, আমাদের মাতা-পিতা থেকে ২৩টি করে ক্রমোসম প্রাপ্ত হই। বিজ্ঞানীরা ১ থেকে ২২ পর্যন্ত একই ধরনের ক্রমোসম চিহ্নিত করেছেন। বাকি একটিকে **'X-Y'** জোড়া হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই জোড়াটিই নির্ণিত করে তুমি পিতা-মাতার ছেলেসন্তান না মেয়েসন্তান। মেয়েদের আছে দুটি **X** ক্রমোসম অপরদিকে ছেলেদের আছে একটি **X** ও একটি **Y** ক্রমোসম। অন্যকথায়, মেয়েদের মধ্যে **Y** ক্রমোসম নেই। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে **X** এবং **Y** এ উভয়টিই আছে। এ কারণে একজন মেয়ে আর অপরজন ছেলে। বিষয়টা আরো বুঝে আসবে পাশের চিত্রটি থেকে। ভালো করে দেখে নাও।
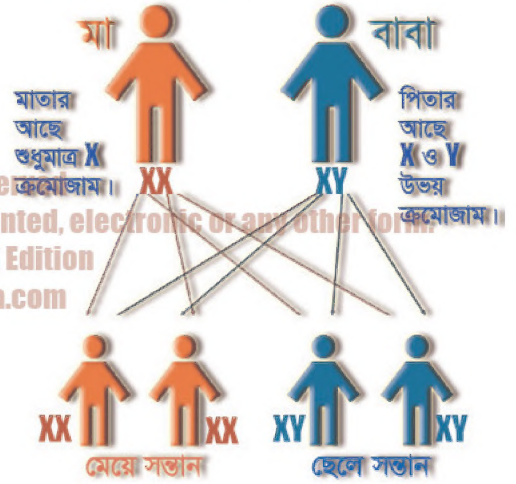
সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে একমাত্র পিতার ওপর। পিতার কাছ থেকে X আসলে সন্তান মেয়ে, আর Y আসলে সন্তান ছেলে।

## অন্যান্য প্রাণির ক্রমোসম

আমাদের ২৩ জোড়া ক্রমোসম সম্পর্কে জানলাম। অন্যান্য প্রাণির ক্রমোসম সম্পর্কে এবার কিছু জেনে নিতে পারি। ডানের টেবিলে বিভিন্ন প্রাণির ক্রমোসম সংখ্যা সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরেছি।

| প্রাণির নাম | ক্রমোসম সংখ্যা |
|---|---|
| মানুষ | ৪৬ |
| মহিষ | ৬০ |
| বিড়াল | ৩৮ |
| গরু | ৬০ |
| কুকুর | ৭৮ |
| গাধা | ৬২ |
| ছাগল | ৬০ |
| ঘোড়া | ৬৪ |
| শূকর | ৩৮ |
| ভেড়া | ৫৪ |

## তোমরা জানো কী?

- কোনো কোনো প্রাণির অনেক ক্রমোসম আছে। কিন্তু ডিএনএ-এর অনেক অংশই শূন্য- কিছু নেই। এরূপ শূন্য ডিএনএ-কে বলে 'আবর্জনা ডিএনএ'। ধারণা করা হয়, 'আবর্জনা ডিএনএ' হচ্ছে কোডহীন (non-coding) ডিএনএ। অর্থাৎ এদের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা আসে না।
- প্রাণি দেহের প্রায় প্রতিটি কোষের মধ্যেই ক্রমোজামের পুরো সেট বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি কোষেই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির যাবতীয় কোড সংরক্ষিত আছে। এর ফলে ক্লোনিং বা কোষ থেকে প্রাণি সৃষ্টির সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে।
- কোনো কোনো ক্রমোসম অপরগুলো থেকে বড়ো- কারণ এতে আছে অতিরিক্ত ডিএনএ মলিকিউল।
- মানুষের ৪৬টি ক্রমোজামের মধ্যে আছে প্রায় ৩০,০০০ জীন।
- 'chromosome' শব্দটি গ্রিক 'পযৎড়সধ' শব্দ ও 'soma' থেকে এসেছে। প্রথমটির অর্থ 'color' (রং) ও দ্বিতীয়টির অর্থ 'body' (দেহ)।



এ বইয়ে এ পর্যন্তই। আর বেশি বলা যাবে না। তোমরা যদি বায়োলজির ওপর উচ্চ পর্যায়ে লেখাপড়া করো তাহলে অবশ্য কোষ সম্পর্কে আরো অনেক বেশি জানতে পারবে।

সমাপ্ত